Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501039 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Abu Ishaq's Novel 'Surya Dighal Bari': A Chronicle of Ruin
আবু ইসহাকের উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ি': ভাঙনের ইতিবৃত্ত

Jhuma Parvin
Former Student
Bengali Department
West Bengal state University

Received on: 13th May 2026
Accepted on: 28th May 2026

Abstract:
Set against the backdrop of Bangladesh, this novel unfolds a history marked by the recurrence of numerous events. On one hand, the narrative explores the social fabric, politics, and religious strictures of Bangladesh; on the other, it depicts the post-Partition movements and the existential struggles that confront individuals with various terrifying, stark realities. Joygun — Hasu's mother — serves as the central protagonist. The story traces how a woman, separated from her husband, navigates the arduous journey of her life while simultaneously waging a ceaseless battle to preserve her very existence. Throughout the novel, one encounters various superstitions, religious dogmatism, and the entrenched dominance of patriarchy. The narrative also bears traces of the famine, the Partition, communal riots, mass starvation, and the socio-political climate preceding the Second World War. Abu Ishaque delves deep into the narrative by casting a critical gaze upon how religious charlatans weaponize people's fervent devotion to faith, transforming it into a tool for human exploitation. 'Surya Dighal Bari' stands as a resounding protest against the exploitation of the devout poor under the guise of religion.

Key Words:
Famine, Partition, Riots, Starvation, Religious Fanaticism, Patriarchy, The Backdrop of World War II, Feminism, Superstition.

মূল প্রবন্ধ

বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)। বাংলা সাহিত্যের সেই সকল লেখকদের একজন তিনি, যাঁদের রচনাসম্ভার সংখ্যার বিবেচনায় হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু তাঁদের কৃতি সৃজনীশক্তি এবং মননশীলতার গুণে কালোত্তীর্ণ। সাহিত্যের অমরত্ব যেহেতু সংখ্যার দ্বারা নয়, নির্ধারিত হয় সৃষ্টিশীলতা এবং সাহিত্য গুণে তাই সেই সাপেক্ষে আবু ইসহাক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম সারির অন্যতম একজন লেখক।

আবু ইসহাক তাঁর সাবলীল লেখনী দ্বারা প্রভাবিত করেছেন সমাজের গতানুগতিক নানা সমস্যার। তুলে ধরেছেন গ্রামীণ সমাজের মানুষের জীবন সংগ্রাম। তাঁর জন্ম শরিয়তপুর জেলার শিরঙ্গাল গ্রামে। তাঁর পিতা মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ, মাতা আতাহারুন্নিসা। কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় আবু ইসহাকের 'অভিশাপ' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে রচিত হতে থাকে তাঁর বিভিন্ন রচনা। ১৯৮৬ সালে উপন্যাস 'পলিদ্বীপ'এ ফুটে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম। ২১ বছর বয়সে লেখা উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ি' তাঁর অমর সৃষ্টি। বলা ভালো এক কালজয়ী এবং সার্থক উপন্যাস। তিনি মূলত গল্প নিয়ে কাজ

© Santiniketan Sahityapath

করেছেন। আমি ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসটির ওপর আলোকপাত করছি। একটি কিংবদন্তি উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তার প্রতিটি দৃশ্যপটের একেবারে নিখুঁত ব্যাখ্যা। যা থেকে বাদ যাবে না সবুজ ঘাসের উপর জমে থাকা স্বচ্ছ শিশির কিংবা ভোরের কাকের দুর্গন্ধময় বিচরণ। অর্থাৎ প্রতিটি দৃশ্যের প্রতিটি উপাদানের উপস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃতি ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা।

১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসটির মূল প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ আর ১৯৪৭ সালের ভারত পাকিস্তানের দেশভাগের পটভূমিতে গ্রামীণ জীবনের সংগ্রাম, কুসংস্কার ও শোষণ। উপন্যাসটিতে যেমন একদিকে ভাঙনের সুর তেমনি অন্যদিকে দেখা মেলে ধর্মীয় ভণ্ডামি, সামাজিক বিধি নিষেধ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার,

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।" সুকান্ত ভট্টাচার্য

মানবক্ষুধা এমন এক পাকস্থলীগত তাড়না, তা কোনো আইন কিংবা ধর্মজাতের হিসেব-নিকাশ না মেনেই মানুষকে টেনে নিয়ে আসে বাস্তবতার এক কঠিন কর্মযজ্ঞের দরজায়।

'সূর্য দীঘল বাড়ি'র আখ্যান পর্বে সূচনা নিছক একখানি কথা সাহিত্যের চরিত্রগুলির জীবনের বারোমাস্যাই কেবল নয়, "বিলকুল ভুলের পথে এগিয়ে চলা বাঙালি সমাজ, ভুলের পথে এগোতে এগোতে, স্বপ্নিল খোয়াবে ভাসতে ভাসতে তেলের শিশির মতই দেশ খানাকে ভাগ করেও যখন বুঝতে পারিনি।" 'পাকিস্তানে'র নামে কোনো 'ফাকিস্থানে'র সাকিনদার তারা হয়ে গেল, এমন এক কালান্তর পর্ব, বাংলা এবং বাঙালির জীবনের সবথেকে মর্মান্তিক দ্রোহকালে 'জয়গুণ' নামক এক চিরন্তন বাঙালি নারী নারীত্বের, মাতৃত্বের দুঃখ যন্ত্রণাক্লিষ্ট অথচ কখনো মেরুদণ্ড না বাঁকানো এক নারীর বেঁচে থাকার লড়াই। জয়গুণ চরিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছিল বর্তমানে নারী সমাজের আত্মোন্নয়নের প্রতীকী অর্থ হিসেবে। শত ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্ত ও নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ তাকে ধীরে ধীরে আরো শক্ত করে তোলে। জীবন সংগ্রাম আর কঠিন বাস্তবতা তাকে নিয়ে যায় এক অন্য জগতে। সে তা মেনে নিতে না চাইলেও এক সময় সে হার মানতে বাধ্য হয়। বহুকাল ধরে অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত ভিটা। এ জায়গাটি ঘিরে রয়েছে অনেক ভয়, অনেক গুজব। শোনা যায় প্রেতাত্মাদের বাস এখানে। এ ভিটাতে থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত। এত কিছু শোনার পরও সেই বাড়িতেই এসে উঠলেন দরিদ্র জয়গুণ ও তার ছেলেমেয়েরা। কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী, পুরুষতন্ত্রের নির্যাতন ও ধনীর শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ঠ।

গ্রামীণ বাংলাদেশের এক নারীর জীবন সংগ্রামের অনবদ্য দলিল 'সূর্য দীঘল বাড়ি'। বাংলায় ১৩৫০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবিভক্ত ভারতের বাংলায় ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে পঞ্চাশের আকাল নামে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে লক্ষ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রাণ হারায়। যারা কোনোমতে শহরের লঙ্গারখানায় পাত পেতে বাঁচতে পেরেছিল তাদেরই একজন একালের স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুণ। সঙ্গে তার মৃত প্রথম স্বামীর ঘরের ছেলে ও দ্বিতীয় স্বামীর ঘরের মেয়ে, আরো আছে মৃত ভাইয়ের স্ত্রীপুত্র। থাকার জায়গা হিসেবে বেছে নেয় পরিত্যক্ত ভিটা। যা নিয়ে রয়েছে অনেক গল্প। জীবন যুদ্ধে যখন সে প্রাণপণ লড়ছে তখন তার প্রতি গায়ের মোড়লের দৃষ্টি পড়ে। দ্বিতীয় স্বামীও তাকে আবার ঘরে তুলতে চায়। সে কারো প্রস্তাবেই সায় দেয় না। এভাবে চলতে থাকে বেশ কিছুদিন। সুযোগসন্ধানী ধূর্ত মোড়লমশাই নানাভাবে জয়গুণকে বিপদে ঠেলে দেয়। আসলে ক্ষমতার অপব্যবহার, কুসংস্কার, প্রতিপত্তি, সম্পদ, সামাজিক বাধা-নিষেধ, এমনকি জাতীয়তাবোধ এইসব কিছুকেই কাজে লাগিয়ে শ্রমজীবী ক্ষুধার্ত মানুষকে ক্রমাগত শোষণ চালাচ্ছে।

সূর্য দীঘল বাড়িতে নিজেদের বাসস্থান গেড়েও তাদের বাস্তবতার পরিবর্তন হলো না। সকালবেলা দু'নলা পান্তা ভাত মুখে দিলেও দুপুরের খিদে চেপে রাখতে হয়। কখনো রাতের খাবারটাও হয় না। এভাবে যে বেশি দিন টেকা যায় না। এক বেলা খাবার জোটাতে জয়গুণকে বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়। তবে তার বাইরে গিয়ে রোজগার করার ব্যাপারখানাতে গ্রামের মোড়ল গদু প্রধানের ছিল প্রচুর মতবিরোধ। তার অবশ্য ব্যক্তিগত কারণ ও আছে। জয়গুণের প্রথম স্বামী ছিল গদু প্রধানের বন্ধু। বন্ধুর বউয়ের এমন উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা মেনে নিতে পারে না। এ উপন্যাসে গদু প্রধানকে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে। শত ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্ত ও নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামকে সে তিলে তিলে গড়ে তোলে, সেটাই তার চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুণ হয়ে ওঠে জাতি-ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলার এক চিরন্তন প্রতিমূর্তি। বাংলার

নানা দোলাচল, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভেতরে তখনো অবিভক্ত। ভাঙনের নেশা জেগেছে মানুষের মনে। সেই নেশাড়ু চোখে সেই সময়ের পূর্ববঙ্গের একটা অংশের গরিব মুসলমান যারা তাদের মুসলমান সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে অক্ষম। এবং মন্বন্তর পরবর্তী রাজনীতির হাওয়া বদলের আভাসে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের মতোই উঁচু জাতের হিন্দুদের কাছে একটা সময় মানুষ বলেই গণ্য হতো না। রাজনীতির পাশার চালে সব বদলাতে শুরু করেছে। আর সেই সুযোগে খেপিয়ে তুলেছে গরিব মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড়োলোক মুসলমানকে। আসলে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষেরা ক্রমাগত অত্যাচারিত হতে হতে তাদের পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সঙ্গে। এই মানুষগুলো যখন ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে সমাজের মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে তখন বিপরীত প্রান্তের মানুষগুলো নানা কৌশলে তাদেরকে আর সফল হতে দেয় না। এই মানুষগুলোর মধ্যেই রয়েছে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, শুভ বুদ্ধি আর সৎ চেষ্টা ছাড়া কোনো অস্ত্রই নেই। অথচ অপরপক্ষে লোকেদের মাথায় থাকে প্রথাগত শিক্ষার বিকৃত উপস্থাপনাজনিত নানা কুচক্রী প্রয়োগের অস্ত্র থাকে অর্থ। থাকে সামাজিক প্রতিপত্তি সঙ্গে যুক্ত হলো সময়ের নিরিখে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। এই রাজনৈতিক প্রতিপত্তিটা কাল নিরপেক্ষ। এই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের নিজের মতো যুদ্ধ করছে এই পিঠের সঙ্গে পেট গিয়ে মেশা মানুষেরা। অনাহারে থাকতে থাকতে তাদের শরীর আর শরীর রইলো না — শরীর বেঁকেছে ধনুকের মতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘‘ওরা কাজ করে’’ সার্থক প্রতিবিম্ব হয়ে তাদের দেহ হয়েছে শুষ্ক। তারপর হয়েছে বিবর্ণ। তবু তারা সমাজ আর সভ্যতার মেরুদণ্ডটাকে এতোটুকু বেঁকে যেতে দেয়নি। আর দেয় নি বলেই যুগ যুগ ধরে, শূন্য উদরে কাজ করে সকলের জন্য উদরের জন্য অন্ন যোগায়।

‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসে বেশি রূপক নেই কথার ঘোর প্যাঁচও নেই। আছে শুধু বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের নির্ভেজাল চিত্র। বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, কুসংস্কার, শিশু শ্রম, অর্থনীতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময়, দেশভাগের পর আন্দোলন, অস্তিত্ববাদের ভূমিকা প্রভৃতি জুড়ে আছে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। উপন্যাসটিতে আমরা প্রতিটি পরতে পরতে দেখতে পাই গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্র, কুসংস্কারের নগ্ন রূপ। শোষণের বিরুদ্ধে নারী ও মানুষের টিকে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষার একটি দলিল। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ মানুষের চরম অভাব ক্ষুধার সঙ্গে চলছে প্রতিনিয়ত লড়াই সমাজে বড়লোক ধনীশ্রেণির ক্রমাগত নিম্নশ্রেণির সাধারণ ক্ষুধার্ত মানুষের ওপর চালাচ্ছে নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন।

উপন্যাসটিতে ভাঙনের সুর স্পষ্ট। মূলত এই ভাঙন গ্রাম বাংলার চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোর ভাঙ্গান। দারিদ্র্যের কারণে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে পৃষ্ঠ মানুষের অস্তিত্বের লড়াই। এক কথায় বলা চলে ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ বাংলার ইতিহাসে এক মাইলফলক, এবং বাংলার গ্রামীণ জীবনের অসামান্য চিত্রায়ন। রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার সংকটে’র ভাষাতে বলতে হয়, ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এই সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা আমাদের নিমজ্জিত করে গেছে যে দেশভাগ, পাকিস্তান সৃষ্টি, পাকিস্তান ভাগ, তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি, এপার বাংলাতেও কত পালাবদল, চৌত্রিশ বছর বাম শাসন, এপার বাংলার প্রেক্ষিতও আলোচনাতে উঠে এসেছে এই কারণে যে উপন্যাসের সময়কাল বাংলা ছিল অবিভক্ত।

সময় মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। দুর্ভিক্ষের সেই পটভূমি আমাদের জানান দেয় বাস্তবতা কত নির্মম, কত ভয়ংকর, আসলে শত শত মানুষের প্রাণনাশ এবং বুভুক্ষ শিশুদের হাহাকার বাতাস ভারি করে তোলে। মানুষ এই পরিস্থিতিতে পেটটাকে টিকিয়ে রাখবার লড়াই করছে। এ লড়াই সকলের লড়াই। এ লড়াই সাধারণ মানুষের লড়াই। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি। পরিশেষে লড়াইয়ের ময়দানে জয়গুণের নতুন প্রত্যাবর্তন মানুষের আশার আলো দেখায়। ধর্মের সাম্রাজ্য পেটটাকে পিঠের সঙ্গে লেপটে দেওয়ার যতই চেষ্টা করে চলো পেট না ভরলে জারি থাক লড়াই। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে শয় শয় সাধারণ নিরন্ন খেটে খাওয়া বাসস্থানহীন মানুষেরা। উদাহরণ হিসেবে জয়গুণ আর সফির মা উল্লেখ্য। চরিত্রের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কাহিনিতে শফির মায়ের সমাজের সঙ্গে আপাতত আপোষকারী চরিত্র, আর জয়গুণের শান্ত ঋজু-দৃঢ় অথচ উদ্ধত নয়, এমন বৈশিষ্ট্য নারীর যাপন চিত্রের বৈচিত্র্য ভয়তার উদাহরণ হলেও জলে জঙ্গালে আজও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবে চোখের জল ফেলেও প্রত্যয়ী লড়াকু চরিত্র, যে চরিত্র পেটের ভাতের প্রশ্নে ও বিকিয়ে দেয় না নিজের সমাজের প্রচলিত ধারার সঙ্গে। জয় করে সহস্র প্রলোভন। এই ঋজু মানসিকতার জন্য পুরুষ সমাজে তার গায়ের লটকে দিতে চায় পাষাণী বিশেষণ, তখনি আত্মীয়ের প্রতি দায়িত্ববোধ আর তার স্নেহের ফল্গুস্রোত আমাদের চমকে দেয়। ছোটো সন্তানদের নিয়ে লড়ছেন জয়গুণ। তেমনি নিজের মতো লড়ছেন শফির মা শফিকে নিয়ে, প্রতিটি মানুষের লড়াইয়ের একটা

© Santiniketan Sahityapath

নিজস্ব আঙ্গিক আছে। নিজে নিজের সঙ্গে লড়তে মানুষ নিজের মতো করে একটা আদল তৈরি করে নেয়। একজনের আদলের সঙ্গে অপরজনের আদলের বেশ কিছু জায়গাতে ফারাক রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য শর্তেও প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে বুঝে বেঁচে থাকার লড়াই, এ লড়াইতে স্থান-কাল পাত্র দেশ লিঙ্গ, ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে একটা মৌলিক মিল থাকে। সেই মিলের তাগিদ তাই বেঁচে থাকার প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে। এখানে থাকার মধ্যেই যেমন একটা সঙ্গীতে সুর বাজে তেমনি সংগতি সুখ শুনতে পাওয়া যায় না-থাকার ভেতরেও।

গোটা উপন্যাস জুড়ে আঞ্চলিক ভাষার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক বেছে নিয়েছেন আঞ্চলিক তথ্যভাষাকে। এক কথায় উপন্যাসের কাহিনিও সামাজিক প্রেক্ষাপট লাভ করেছে এক জীবন্ত রূপ। আসলে উপন্যাসটিতে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাবো এক কঠিন সময় অর্থাৎ দেশভাগের অব্যাহতির পূর্বে ৪৩ এর মন্বন্তর শহরে ঠাঁই না পাওয়া গ্রামের মানুষদের বিবরণ দিচ্ছেন: ''ভাতের লড়াইয়ে হেরে যায় তারা। অতীতের কান্না চেপে চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হোচট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।'' ফিরে আসা জনতার এমন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসিক জয়গুণ তার পরিবারকে হাজির করেছেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত আপামর জনগোষ্ঠীর একটি পারিবারিক চিত্ররূপে। ভাগ্যের জোরে নিষ্কৃতি পেয়েছে নিজে থেকে। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষ গ্রাস করেছিল তার স্বপ্নগুলিকে, একেবারে শূন্য থেকে শুরু হলো জয়গুণের নতুন পথচলা। সমাজের শোষণ, নিপীড়নকে পায়ে ঠেলে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজের হীন সমাজপতিদের তৈরি করা হীনতার নিয়ম ভেঙে এগিয়ে চলে জয়গুণ। নিজের চেষ্টায় অকূল পাথরে কুল খুঁজে পায় সে। লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় কাজে। নয় তো পেট চলবে কি করে! এ সমাজ বড়ো এবং রক্ষণশীল। দরিদ্র এবং নারী এই দুই পরিচয় যেন তাকে প্রতিকার হীন শোষণের দুটি ভিন্ন অভিধা দেয়। তার পালিত হাঁসের ডিম সে পুত্র মারফত দান করে আসে মসজিদে। কিন্তু ইমাম সাহেব হারাম আখ্যা দিয়ে তা নিতে অস্বীকার করে। কেননা বেপর্দা জয়গুণ কাজ করে খায় অন্যের বাড়িতে। ভিন্ন গ্রামে মেয়ের বিয়েতে তাকে তওবা করতে হয়। এই মর্মে যে তাকে বাইরের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। পরিবারের একমাত্র আয়ক্ষম মানুষটির ঘরে হাত ঢুকিয়ে বসে থাকার দরুন তীব্র অভাব, অনাহার দেখা গেলেও খোদার প্রীতি অটল শ্রদ্ধাশীল জয়গুণ তওবা ভঙ্গ করেনি। এই অংশে সাধারণ মানুষের সরল ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা প্রত্যক্ষ করি। আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কী করে শোষণের কৌশল হিসেবে চিরকাল কুসংস্কার ধর্মীয় গোঁড়ামী সামাজিক প্রতিপত্তিকে অস্ত্র বানিয়ে রাখে, ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা জয়গুণকে তওবা করে চার দেয়ালে বন্দি করে রাখে, কিন্তু কখনোই তার বাড়িতে এক বেলার খাবারের ব্যবস্থা করেনি। কোনো বিকল্প হালাল আয়ের ব্যবস্থা এক কথায় কুসংস্কার ও সামাজিক কূপমণ্ডকতার জীবন্ত চিত্র। তার প্রতিফলন আমরা দেখি গ্রামের অশিক্ষিত প্রান্তিক নারী জয়গুণের গভীর দার্শনিকতার বোধে, ''না খাইয়া জানেরে কষ্ট দিলে খোদা বেজার অয়। মরলে পরে খোদা জিগাইব, তোর আত-পাও দিচ্ছিলাম কিয়ের লেইগা? আর দিছিলাম খাটবার দেইখ্যা, পাও দিছিলাম বিদ্যাশে গিয়া ট্যাকা রুজি করনের লেইগ্যা।''

উপন্যাসে সংস্কারের ঘুণপোকা কুরে কুরে খেতে থাকে জয়গুণকে। তার মনে হয় রাস্তায় পুরুষ মানুষদের সঙ্গে হেঁটে কাজ করে সে খোদার কাছে পাপ করছে। গ্রামীণ ছায়ায় দোজখের বিবরণ তাকে ভয়ার্ত করে। কিন্তু ক্ষুধাতুর পেট কী আদেশ-নিষেধ মানে? মানুষকে সমস্ত বাধা ভেঙে বাইরে বের করে আনায় যে তার ধর্ম! ছেলে মেয়েগুলোর অনাহার ক্লিষ্ট মুখগুলো তার ভুলিয়ে দেয় তওবার কথা। সে উপলব্ধি করে জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

আবু ইসহাক তাঁর উপন্যাসে জয়গুণের চরিত্রকে কেন্দ্র করে এক চরম বুভুক্ষার চিত্র এঁকেছেন। ছিন্নমূল মানুষেরা সর্বত্র বঞ্চিত, শহুরে বিলাস স্বাচ্ছন্দের পশ্চাৎ পটে অনলগ্রাসী আক্রমণের অসহায় শিকার হয় সর্বত্যাগী সর্বপ্রেক্ষিত জয়গুণেরা সমাজের প্রথা ভাঙ্গার পর একজন নারীকে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সব রকম প্রতিকূলতা জয়গুণ কাটিয়ে উঠেছে। এমনকি জয়গুণের প্রতিটি সংলাপ চোখে পড়ার মতো, ''ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি?'' জয়গুণ বুঝেছে জীবন রক্ষা করায় ধর্মের প্রথম ও মূল মন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে-কোনো অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নেবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার কোন ভয় নাই।'' এখানে লক্ষণীয় উপন্যাসিক এখানে ধর্মকে হেয় করেন নি। তিনি হেয় করেছেন ধর্মের অপব্যাখ্যা দেওয়া মানুষদের যারা ধর্মের চেয়েও স্বার্থকে বড়ো করে দেখে। ধর্মীয় গোঁড়ামী মনের ভেতরে বেঁধে রাখা কুসংস্কারাচ্ছন্ন

মানুষদের নিন্দা করেছেন। আসলে সমাজের কুসংস্কার গোঁড়ামী এক ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। মানুষ খুব সহজে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে ধর্মের নামে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ সুদূরপ্রসারী জমিনে আঁকা এক কালজয়ী উপন্যাস। উপন্যাসে ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ কেবলমাত্র থাম-খুঁটি আর কয়েক খানা অন্ধকার ঘরে নিথর আলয় হয়ে থাকেনি। বরং হয়ে উঠেছে গোটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিরূপ। আদিভৌতিক ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’র মতোই এর সমাজ নারীর পক্ষে অশুভ পদে পদে সে শৃঙ্খলিত করতে চায় নারীর স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দিত গতিকে, নানা নিয়মের বেড়াজালে তাকে আটকে রাখতে চায়। আসলে ভাঙাগড়ার এই ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সময় আর বাস্তবতা নতুন ভাবে ধরা দিয়েছে বিগত দিনের ব্যবস্থাপনায়। নারীর মর্যাদা আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের চরম উদাহরণ জয়গুণ চরিত্রটি। আমরা দেখেছি কীভাবে উপন্যাসটিতে ভাঙনের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে, দেখেছি ছিন্নমূল খেটে খাওয়ার নিরন্ন মানুষের হাহাকার, আর বহু শিশুদের আর্তনাদ। সবমিলিয়ে চলছে অরাজকতা।

পরিশেষে বলতে পারি ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসটি এক ভাঙনের ইতিবৃত্ত। সাধারণ মানুষের যে করুণ পরিণতি এবং শত শত বাসস্থান হীন মানুষের নতুন যাত্রাপথ এক অন্য কথা বলে। আমরা সেইসব মানুষের কথা বলতে পারি যারা সব হারিয়ে পথে বসেছে, আমরা দেখেছি দুর্ভিক্ষে সেই ভয়াল রূপ, দেখেছি ধর্মের নামে মানুষের বোকা বানানোর এক নোংরা চিত্র। আসলে উপন্যাসটির আদ্যোপান্ত জুড়ে রয়েছে নানা মুসলিম সমাজের একটি নির্ভেজাল চিত্র।

তথ্যসূত্র:

১। আবু ইসহাক, ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’, দেজ বুক স্টোর, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা
২। https://archive.roar.media

Prantik Gabeshana Patrika